ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, April, 2026, Page No. 202-209
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.450

বাদল সরকারের ‘পাগলা ঘোড়া’: বিকল্প থিয়েটারের এক অন্তর্দৃষ্টি

শুভজিৎ রায়, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 05.04.2026; Accepted: 08.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In Bengali theatre, Badal Sarkar is a playwright who not only wrote plays but also transformed the way theatre is perceived. His theatrical vision stands as a significant protest against the limitations of the conventional proscenium stage, and the structured artistic expression of that protest is known as “Third Theatre” or “Alternative Theatre.” In this context, the play “Pagla Ghoda” is particularly noteworthy. Although the play appears to revolve around fragmented and crisis-ridden themes of death, memory, love, guilt, and patriarchal mentality, at its core it embodies a distinct theatrical philosophy. Here, drama is not confined merely to storytelling; rather, it expresses the darkness of the human mind, social cruelty, and existential questions in a theatrical language that transcends traditional stage conventions.

The play, centered on a cremation ground, reveals the inner emptiness of life, suppressed love, the pain of memory, and socially constructed moral hypocrisy. In this article, “Pagla Ghoda” has been analyzed from the perspective of alternative theatre. Special attention has been given to the play’s thematic structure, form, characterization, language, symbolism, stagecraft, and its underlying relationship with Badal Sarkar’s theatrical philosophy. The aim of this discussion is to show that, for Badal Sarkar, alternative theatre was not merely a technical change in stagecraft; rather, it was an artistic medium for reinterpreting life and society from a new perspective.

Keywords: Badal Sarkar, Pagla Ghoda, Alternative Theatre, Third Theatre, consciousness of death, existential crisis, theatrical language, symbolic stagecraft

‘পাগলা ঘোড়া’ নাটকটি নাট্যকার রচনা করেন ১৯৬৭ সালে। ১৯৭১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ‘বহুরূপী’ নাট্যদল দ্বারা অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে এই নাটকটির প্রথম অভিনয় হয়। নাটকে আমরা দেখতে পাই ঘটনাস্থল শ্মশান। সেখানে পুড়ছে একটা মেয়ে। বাইরের আগুনে নয় ভিতরের আগুনেই পুড়ছে মেয়েটা। সমাজে নারীত্বের মর্যাদা না পেয়ে প্রতি পলে পলে মেয়েগুলো যে মরছে, মেয়েটা সেরকমই একটা মেয়ে। নির্দিষ্ট কোনো নাম দেওয়া হয়নি মেয়েটির। সাধারণ তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের একটি মেয়ে। এই মেয়েটাকে যারা শ্মশানে দাহ করতে এনেছে, তারা চিতা জ্বালিয়ে, মেয়েটিকে চিতায় চড়িয়ে, বসে আছে নীরন্ধ্র অন্ধকারের নীরবতায়। হিমাদ্রি, শশী, সাতু, আর কার্তিক- এই চারটি চরিত্রও ওই মেয়েটির মতই সাধারণ মানুষ। তাদের জীবনধারণও এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। একেবারেই সাদামাটা নিস্তরঙ্গ জীবন। অথচ এদের প্রত্যেকের ভিতরেই রয়েছে একটা জীবন-

যে জীবন অবচেতন থেকে উঠে আসে সুযোগ মতো। আজকে এই শ্মশানের স্বল্পালোকে মৃত্যুর প্রেক্ষাপটে সেই জীবনকে ধরতে চাইছেন নাট্যকার। নাটকটি নিশ্চয়ই নারী শোষণ ও তার প্রতি অত্যাচারের তথাকথিত সামাজিক নাটক নয়, সেই প্রথাসিদ্ধ সামাজিক সমস্যা নিয়েও এই নাটক নয়। এখানে সমাজের ভিতরকার সাদামাটা কয়েকটি মানুষের সামগ্রিক জীবনবোধই উঠে এসেছে নাটকে। সেখানে শ্মশানের পটভূমিতে মৃত্যুর প্রেক্ষাপট রচিত হতে হতে অনুসন্ধান চলে জীবনের। এখানে হতভাগা মেয়েটা চিতার আগুনে জ্বলে আর জুড়ায় এবং শ্মশানে বসে আছে যারা তারা নিঃশব্দে দাহ দেখে আর মদ্যপান করে-

"হিমাদ্রি: নিন, শুরু করুন আপনারা।
সাতু: চিয়ার্স।
শশী: চিয়ার্স।
কার্তিক: সে আবার কী?
হিমাদ্রি: (হেসে) সে কি কার্তিকদা, চিয়ার্স বলে খেতে হয় আপনি জানেন না?
কার্তিক: না! আমি বলি- তারা তারা কালী ব্রহ্মময়ী মা!
[ঢক করে এক চুমুকে অনেকখানি খেয়ে মুখটা ইষৎ বিকৃত করলো]
আহা, এমন না হলে বিলিতি? বুক জুড়িয়ে গেলো একেবারে।"[১]

পাশ্চাত্য পুরাণে এমন কথিকা রয়েছে, যেখানে মৃত্যুর দূত হয়ে ঘোড়া আসে- উন্মত্ত ঘোড়া। এখানে নাট্যকাহিনির কল্পনায় সেরকম একটি ক্ষীণ আভাস থাকলেও, সেই প্রতীকী চিত্রকলা এখানে নাট্যকার ব্যবহার করেননি। বরং নাট্যকার পাগলা ঘোড়ার রূপকল্পে মানুষের ভালোবাসার সুতীব্র গতিময়তাকেই পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন। প্রত্যেক মানুষের ভিতরেই রয়েছে সেই পাগলা ঘোড়া। যা কিনা মেয়েটাকে টেনে নিয়ে গেছে মৃত্যুর দিকে। প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে যে চিতা জ্বলছে, হারানোর, বেদনার, হাহাকারের, বিষণ্ণতার চিতা জ্বলছে, তাতেই তো পুরে চলেছে প্রত্যেকের জীবন, তার চাওয়া-পাওয়া, প্রেম-ভালোবাসা। মেয়েটা জীবনকে ভালবেসেছিল, তার মধ্যেই বাঁচতে চেয়েছিল। জীবনের প্রেমে পাগল হতে চেয়েছিল। নাট্যকারের অনুভবে যেন পাগলা ঘোড়ায় আক্রান্ত মেয়েটা নিজের মধ্যেই নিজে পুড়ে চলেছে। মানুষ মরতে মরতেও বাঁচতে চায়। জ্বলতে জ্বলতে জুড়াতে চায়। শ্মশানে উপস্থিত অন্য চারটি চরিত্র প্রথমে প্রবল নির্লিপ্ততায় সেখানে হাজির হয়ে বসে ছিল। নির্বিকারভাবে তাস খেলছিল, মদ খাচ্ছিল, মেয়েটা পুড়ে চলেছিল। কিন্তু এইসবের মধ্যেও তো জীবন ছিল- প্রত্যেকের একটা নিজস্ব জীবন ছিল- শ্মশানে অন্ধকারে এবং চিতার আগুনে সেগুলিই যেন সত্য হয়ে প্রকাশিত হয়ে থাকলো। হিমাদ্রি ছিল স্কুল টিচার। তার এই স্কুল টিচারের গতানুগতিক জীবনে একটি মেয়ে এসেছিল। খুব সহজভাবেই এসেছিল। কিন্তু হিমাদ্রি সেই মেয়েটির প্রেমে পাগল হয়ে যেতে পারেনি। সহজে পেয়েও তাকে গ্রহণ করতে পারেনি। মিলি ছিল উচ্চবিত্ত সমাজের মেয়ে। সেরকম ধনী সুন্দরী কন্যাকে পেয়েও হিমাদ্রি পাগল হতে পারেনি। অথচ ওদিকে মিলি হিমাদ্রিকে পেয়ে নিজস্ব সত্তা হারিয়ে ফেলেছে-

> "বলো! বলো! তাই চাও তুমি? যদি চাও তো আমি তা-ই করবো। তুমি জানো আমি তা-ই করবো। আমার না করে উপায় নেই, সেইজন্যেই কি বারবার আমার মুখটাকে মাটির উপরে ঘষে দাও তুমি?"[২]

কিন্তু হিমাদ্রি সত্তার অন্তরস্থলে প্রবেশ করতে পারেনি। ঘটনাচক্রে ক্রমেই দুজনে দুজনের জীবন থেকে সরে গিয়ে নিঃসঙ্গ হয়ে গেছে। সাতুর কাজ ঠিকাদারি। নানা জায়গায় ঠিকাদারির কাজ করতে হয় তাকে নানা ধরনের মানুষজনকে নিয়ে। সেই সুবাদে তার জীবনে কুলিকামিন মেয়ের অভাব হয়নি। যৌন আস্বাদনেও কোনো ঘাটতি হয়নি। এইভাবে, আলগাভাবে জীবন উপভোগকেই সে জীবনের সবকিছু পাওয়া বলে ভেবেছিল।

কিন্তু তার অন্তরের অন্তঃস্থলেও যে পাগলা ঘোড়া রয়েছে- সে ছাড়বে কেন। সেওতো জীবনের মর্মমূলে বসে জীবনের পাওনার হিসাব কড়ায় গন্ডায় বুঝে নিতে চায়। সাতু এতসব মেয়ের মধ্যেও লছমী নামের যে মেয়েটির সঙ্গে মিশে ছিল, তাকে ভুলতে পারেনা। লছমীর স্মৃতি তাকে কুরে কুরে খায়। শ্মশানের নিভৃতে কুকুরের ডাক সাতুর মনের মধ্যে ফিরিয়ে আনে স্মৃতিকে, লছমীকে। লছমীর ছিল চিরসঙ্গী একটা কুকুর। সবসময়ে তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতো। কুকুরের ডাক সাতুর মনে সেই লছমীর স্মৃতি ফিরিয়ে আনে। শুধু যৌনতাড়না নয়, কোথায় যেন একটা ভালোলাগার- একটা ভালোবাসার রেশ সাতুকে দুর্বল করে রাখে। লছমী শুধু দেহ দেয়নি, তারপরেও লছমী তাকে নিজের করে পেতে পেয়েছিল। এসব কিছু ছেড়ে একেবারে একান্তে পরিচয়হীন ভাবে সে সাতুর কাছে থাকতে চেয়েছিল। তার জীবনের সঙ্গে নিজের জীবন জড়িয়ে রাখতে চেয়েছিল। বাঁচতে চেয়েছিল সাতুকে আঁকড়ে ধরেই। সাতু পারেনি তাই ফিরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু মনের কোণে সে ভালোবাসা আজ যেন শ্মশানের নিস্তব্ধতায়, অন্ধকারে-আলোতে গুমরে গুমরে প্রকাশ পায়। লছমী হারিয়ে গিয়েছিল সাতুর জীবন থেকে। কিন্তু কুকুরটি তাকে ছেড়ে যায়নি। সাতু যখন মৃত লছমীর মুখাগ্নি করতে গিয়েছিল শ্মশানে, তখন সাতুর সব আচরণের প্রতিবাদে কুকুরটি তীব্র চিৎকার করে উঠেছিল। যেন লছমীর গুমরে মরা প্রতিবাদের উচ্চকিত স্বর হয়েই কুকুরটির চিৎকার আর্তনাদে পৌঁছে গিয়েছিল। আর এই শ্মশানের আলো-অন্ধকার, কুকুরের আওয়াজ- এসব কিছু তাকে অপরাধবোধে আক্রান্ত করে। লছমীর প্রেম-ভালোবাসা তাকে জীবন ভরিয়ে দিতে পারেনি। কিন্তু তার মৃত্যু তাকে জীবন বুঝে নিতে অনেকখানি সাহায্য করেছে। তাই সাতুর উপলব্ধি-

> "মরণ দেখলেই বোধহয় জীবন দেখা সম্ভব।"[৩]

সাতু অবশ্য পরে নিজের ভুল বুঝে তার দার্শনিকের মতো বলে-

> "পেলেই গন্ডগোল। পেয়ে রাখতে তো আমরা কেউ জানি না? ছোট ছেলের খেলনার মতো ভেঙে গেলো বলে ভ্যা ভ্যা করে কাঁদি।"[৪]

কার্তিক কম্পাউন্ডার। হরেকরকম মানুষজনকে নানা রকমের ওষুধ দেওয়াই তার কাজ। রোগাক্রান্ত মানুষদের দেখতে দেখতে জীবন সম্পর্কে তার ধারণা হয়ে গেছে অন্যরকম। তাই কার্তিক তার কম্পাউন্ডারের জীবনকে দেখছে অন্যভাবে। তার বোধ-

> "বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো হয়-না কখনো।"[৫]

কার্তিক তার জীবন অভিজ্ঞতার কথা বলে ঘুরিয়ে। সে এক রাস্তার মুচির গল্পের মোড়কে নিজের কথা বলে যায়। মুচির গল্পের মধ্যে দিয়ে কার্তিক নিজের গল্প বলে চলে। একটি মেয়েকে শুধু দেখে যেত সে। মুগ্ধ চোখে দেখে যেত। দেখতে দেখতে সেই মেয়েটিকে ভালোবেসে ফেলেছিল সে। মনে মনে ভালোবাসার পাহাড় জমিয়েছিল সে। একদিন সেই মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর মেয়েটি চলে গেল কোথায় কত দূরে? কিছুদিন পরে মেয়েটি আবার ফিরে আসে। বিবাহিত জীবনে মেয়েটি কোনো সুখ পায়নি। ফিরে এসেছে এখানে। মুচি সবটাই দেখে চলে। মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে পারে না। সে ভিতরে ভিতরে জ্বলে। আবার মেয়েটিকে চোখের সামনে দেখতে পেয়ে নিজেকে জুড়ায়ও। কার্তিকের বলা গল্পের মেয়েটির সঙ্গে নাটকের মেয়েটার কী অদ্ভুত মিল। সেওতো উন্মাদ স্বামীর পাল্লায় পড়ে, বিবাহিত জীবনে বঞ্চিত হয়ে, বন্দিজীবন কাটিয়ে ফিরে এসে পড়েছে মল্লিক বাবুর কব্জায়। মেয়েমানুষ লোভী মল্লিক তাকে চটকায়। প্রেম বিহীন জীবনে সে মৃত্যু কামনা করে। কম্পাউন্ডার কার্তিকের কাছে মেয়েটা বিষ নিতে আসে। এ জীবন সে আর রাখতে চায় না। কার্তিক মেয়েটাকে সাত দিন অপেক্ষা করতে বলেছিল। এতো ওষুধ দেওয়া কম্পাউন্ডারের কথা নয়। কোথাও পাগলা ঘোড়ার উন্মাদনা কী ভিতরে কাজ করে যায়নি? কেননা বেঁচে থাকলে সবই সম্ভব- এমন একটা ক্ষীণ আশা কার্তিকের ভেতরে কাজ করেছিল। তাই সে এখনি না মরে, আরও সাত দিন জীবনটাকে দেখতে বলেছিল।

পাগলা ঘোড়ার মতো পাগল প্রেমের অভাবী মেয়েটা কার্তিককে সাত দিনও সময় দিলো না। এই মেয়েটা যদি জানতো যে, দিনের পর দিন একজন তারই প্রেমে পাগল হয়ে প্রতীক্ষা করে আছে নিঃশব্দে, গোপনে- তাহলেও কী সে মরতে পারতো এভাবে। মেয়েটাতো জীবনযন্ত্রনার মধ্য দিয়েই বাঁচতে চেয়েছিল, মরণযন্ত্রনার মধ্যে মরতে নয়। মেয়েটা চিতা থেকে চিৎকার করে উঠে-

"নামিয়ে নিয়ে এসো!

জ্বলছে- নামিয়ে নিয়ে এসো- পাগলা ঘোড়া! ফিরিয়ে নিয়ে এসো- আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো- পাগলা ঘোড়া-!"[৬]

মানুষ মরতে মরতেও বাঁচতে চায়। জ্বলতে জ্বলতে জুড়াতে চায়। শশী ভালোবেসেছিল মালতীকে। এই মালতীর সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয় শশীর খুড়তুতো ভাই প্রদীপের সঙ্গে। প্রদীপ ভালো ছেলে ছিলোনা। সে মদ্যপ এবং লম্পট। মালতী এসব জানতে পেরে তাকে বিয়ে না করে শশীকে জীবনে পেতে চেয়েছিল। কিন্তু শশী পারেনি, পেরে উঠেনি। মালতীকে ভালোবেসেও তাকে বিয়ে করতে পারেনি। সমাজ ও মন- এই দুইয়ের বাধায় শশী সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি-

> "প্রদীপের কাছে নয় মালতী। আমার নিজের কাছে। আমার নিজের কাছে নিজের মুখ থাকবে না।"[৭]

সে নিরুপায় হয়ে মালতীকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। অথচ তার এই বিবশ অক্ষমতার জ্বালা তাকে ভিতরে ভিতরে পুড়িয়ে মেরেছে। তাই শশী নির্লজ্জের মতো মালতীকে জানিয়ে দেয় -

> "আমি কোনোদিন ভুলতে পারবো না, আমার জন্যে তুমি প্রদীপের জীবনটা নষ্ট করে দিলে।"[৮]

মালতীর কাতর অনুনয়, তার সুগভীর প্রেম- কিছুই শশীকে টলাতে পারেনি। মালতীর উপর শশীর এই অবিচারের ফলেই যেন মালতীর মৃত্যু হয়। প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে সে মালতীকেও হত্যা করেছে। কেননা, দুশ্চরিত্র প্রদীপ মালতীকে ক্রোধ ও ঈর্ষার জ্বালায় ছুরির আঘাতে হত্যা করে। যে রুপার ছুরিটি কিনা শশীরই দেওয়া উপহার। সবটা জানতে পেরে যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয় শশী। এইভাবেই হিমাদ্রি, কার্তিক, শশী, সাতু- প্রত্যেকের গল্প আলাদা আলাদা হয়েও এক হয়ে যায়। আবার একের গল্প হয়ে যায় অনেকের। সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের প্রত্যেকের হৃদয়েই রয়েছে এমনই একটি জ্বলন্ত চিতা, যার আগুন জ্বলছে প্রতিনিয়ত। হৃদয়ধর্ম ও সামাজিক সত্তার চিরন্তন দ্বন্দ্বে প্রত্যেকটি মানুষ কোথায় যেন ভিতরে ভিতরে দগ্ধ হয়ে চলেছে, যন্ত্রনায় বিদ্ধ হয়ে চলেছে। শ্মশানের অন্ধকারে চিতার আলোতে প্রত্যেকের হৃদয় চিতা জ্বলে উঠেছে। প্রত্যেকের গল্প আলাদা আলাদা হয়েও একাকার হয়ে যায়। শেষ জীবন-জিজ্ঞাসায় একটা সত্যের মুখোমুখি পাঠক দাঁড়িয়ে যায়-

> "বেঁচে থাকলে- সবই সম্ভব? সাত দিন সময় দিলো না। সাতটা দিন। আমি-আমিও-কী? তবে কি শেষ দেখা হয়নি এখনো? বেঁচে থাকলে সবই সম্ভব?"[৯]

তার সঙ্গে এই ভাবনারও মুখোমুখি হতে হয় যে, জীবনে যাকে চেয়েছি, অথচ পাইনি, কিংবা পেয়েও গ্রহণ করতে পারেনি, যাকে বিস্মৃত হতে চেয়েছি নানাভাবে- কিন্তু সে তো পাগলা ঘোড়া- তার নাচন চলে ভিতরে ভিতরে। তাকে থামায় কে? মরণের মাঝখানে জীবনের আস্বাদ নতুন করে ভরপুর হয়ে উঠে। চিতায় উঠেছে যে মেয়েটা, সেই মেয়েটাই তো জীবনের নানা রকমফেরে নানারূপে দেখা দেয়। বিচিত্র রূপিনী নারী প্রকারান্তরে পুরুষের জীবনে একই নারীসত্তায় আবির্ভূত হয়। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনকে দেখতে গিয়ে নাট্যকার জীবনের নানা অধ্যায়কে একাকার করে ফেলেন এই নাটকীয় কৌশলে।

বাংলা নাটকের ইতিহাসে বাদল সরকারের আবির্ভাব এমন এক সময়, যখন নাট্যমঞ্চ ক্রমশ একদিকে শহুরে মধ্যবিত্তের বিনোদন ও সংস্কৃতিচর্চার অভ্যাসে আবদ্ধ হয়ে পড়ছিল, অন্যদিকে সমাজ-বাস্তবতার গভীরতম

সংকটকে মঞ্চে রূপ দেওয়ার জন্য নতুন শিল্পভাষার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল। এই প্রয়োজন থেকেই বাদল সরকারের নাট্যসাধনা ধীরে ধীরে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায়, যেখানে নাটক আর কেবল পাঠ্য বা মঞ্চায়িত কাহিনি থাকে না; তা হয়ে ওঠে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, সামাজিক আত্মসমালোচনা এবং দর্শকের সঙ্গে জীবন্ত সংলাপের ক্ষেত্র। তাঁর 'তৃতীয় থিয়েটার' ধারণা এই বৃহত্তর শিল্প-দর্শনেরই ফল। দর্শন চৌধুরী লিখেছেন-

> "প্রসেনিয়াম থেকে অঙ্গনমঞ্চ, সেখান থেকে মুক্তমঞ্চ, তারপরে গ্রাম পরিক্রমা, নাটক নিয়ে, নাট্যদল নিয়ে বাদল সরকার বেরিয়ে পড়লেন গ্রাম থেকে গ্রামে। দর্শকের জন্য বসে না থেকে নাটকের দলই বেরিয়ে পড়ল দর্শকের সন্ধানে- আমজনতা, শ্রমিক মেহনতি মানুষের সন্ধানে।"[১০]

'পাগলা ঘোড়া' নাটকটি সেই ধারার একটি অনন্য উদাহরণ, যদিও এটি প্রথম পাঠে এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক ও প্রতীকী নাটক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু গভীর বিশ্লেষণে বোঝা যায়, এই নাটকের বিষয়, বিন্যাস, প্রতীক এবং সামগ্রিক নাট্যবোধ বাদল সরকারের বিকল্প থিয়েটার-ভাবনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। 'পাগলা ঘোড়া' নাটকের ঘটনাস্থল একটি শ্মশান। শ্মশান কেবল একটি স্থানের নাম নয়; এটি এমন এক মানসিক ও দার্শনিক পরিসর, যেখানে জীবন, প্রেম, স্মৃতি, হারানো সময় এবং মৃত্যুর চূড়ান্ত সত্য একত্রিত হয়। চারজন পুরুষ একটি অজ্ঞাতপরিচয় যুবতীর মৃতদেহ দাহ করতে এসে রাতের পর রাত কাটাতে কাটাতে নিজেদের অতীত, ভগ্ন প্রেম, অস্বীকার, পাপবোধ এবং আত্মগোপনের মুখোমুখি হয়। নাটকের আঙ্গিকটি এই অর্থে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যে এখানে দৃশ্যমান ঘটনাক্রমের থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে মনের ভিতরের ঘটমানতা। বাইরের ঘটনাবলির সরল ক্রম এখানে মুখ্য নয়; বরং স্মৃতি, স্বীকারোক্তি, অবদমন, আত্মপ্রবঞ্চনা এবং মৃত নারীর অনুপস্থিত অথচ সর্বব্যাপী উপস্থিতি নাট্য-বাস্তবতার নির্মাণ করে। এর মধ্য দিয়েই বাদল সরকার দর্শককে গল্পের ভেতরে নয়, বরং মানব-অস্তিত্বের গভীর প্রশ্নের মধ্যে প্রবেশ করান। এই নাটকের অন্যতম কেন্দ্রীয় উপাদান হল মৃত্যুচেতনা। তবে এই মৃত্যুচেতনা কেবল দেহের অবসান বা জৈব সমাপ্তির ধারণায় সীমাবদ্ধ নয়। এখানে মৃত্যু একাধিক স্তরে কাজ করে। প্রথমত, একটি যুবতীর মৃত্যুর ঘটনাটি নাটকের প্রাথমিক পরিস্থিতি নির্মাণ করে। দ্বিতীয়ত, চারজন পুরুষের মানসিক জগতে আমরা এমন এক জীবন্মৃত অবস্থার সন্ধান পাই, যেখানে তারা দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের মানবিক সততা, প্রেমের সত্য এবং নৈতিক সাহস হারিয়ে বেঁচে আছে। তৃতীয়ত, সমাজের বিধিনিষেধ, পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং সুবিধাবাদী মানসিকতা মানবসম্পর্কের স্বতঃস্ফূর্ততাকে হত্যা করে- এই বৃহত্তর সামাজিক মৃত্যুও নাটকে ক্রমশ উন্মোচিত হয়। ফলে 'পাগলা ঘোড়া' নাটকে শ্মশানের আগুন কেবল মৃতদেহ দাহ করে না, জীবনের গোপন পচনকেও আলোকিত করে। নাটকের চার পুরুষ চরিত্র বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তারা প্রত্যেকেই আলাদা ব্যক্তি হলেও নাট্যরীতির স্তরে তারা অনেকাংশে এক সমষ্টিগত পুরুষমানসের প্রতিনিধি। তাদের প্রত্যেকের জীবনেই প্রেম এসেছে, কিন্তু সেই প্রেমের দায়, গভীরতা বা নৈতিক আহ্বান তারা গ্রহণ করতে পারেনি। সামাজিক ভীতি, আত্মস্বার্থ, শ্রেণি-অহং, পৌরুষের ছদ্মগরিমা অথবা নৈতিক কাপুরুষতা তাদের প্রেমকে অপূর্ণ ও বিপর্যস্ত করেছে। ফলত মৃত নারী চরিত্রের অনুপস্থিত সত্তা নাটক জুড়ে তাদের বিচার করে চলে। এখানে নারী চরিত্রের অনুপস্থিতিই তার শক্তি। তিনি মঞ্চে দেহরূপে প্রায় অচল, অথচ নাট্য-অর্থে তিনি সবচেয়ে জীবন্ত উপস্থিতি। এই কৌশলের মধ্য দিয়ে বাদল সরকার পুরুষ-নির্মিত ভাষা ও সমাজের কেন্দ্রে এক অনুপস্থিত নারীর নীরব অভিযোগকে স্থাপন করেছেন।

এই নাটকের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো স্মৃতির নাট্যরূপ। 'পাগলা ঘোড়া' সরলরৈখিক কাহিনি অনুসরণ করে না। নাটকের বয়ান ভেঙে যায়, ফিরে যায় অতীতে, চরিত্রদের মনের অবচেতন স্তরে প্রবেশ করে, কখনও বাস্তব, কখনও স্মৃতি, কখনও দুঃস্বপ্নের মতো এক আবহে অগ্রসর হয়। এই গঠনরীতি প্রচলিত

নাট্যরীতির তুলনায় অনেক বেশি ভাঙাচোরা, তরল ও অন্তর্মুখী। এখানে সময় সরল ধারায় প্রবাহিত হয় না; বরং সময় মানসিক অভিজ্ঞতা হিসেবে কাজ করে। এই কৌশল বিকল্প থিয়েটারের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত, কারণ বাদল সরকার নাটককে কেবল ঘটনাবলির বহিঃপ্রকাশ হিসেবে নয়, চেতনার অভ্যন্তরীণ নড়াচড়া হিসেবে দেখতে চান। দর্শকও তাই বাহ্যিক কাহিনির অনুসরণকারী নয়; তাকে প্রবেশ করতে হয় চরিত্রদের দ্বিধা, ব্যর্থতা, অনুশোচনা ও আত্ম উন্মোচনের প্রক্রিয়ায়। বিকল্প থিয়েটারের অন্যতম লক্ষণ হলো মঞ্চের বাহুল্য বর্জন করে অভিনয়, শরীর, সংলাপ এবং পরিস্থিতির ঘনত্বকে প্রধান করে তোলা। 'পাগলা ঘোড়া' এই অর্থে এক অত্যন্ত উপযোগী নাটক। এর জন্য জটিল মঞ্চসজ্জা, বড়ো আয়োজন, ব্যয়বহুল আলোক পরিকল্পনা বা বাস্তবধর্মী সেট অপরিহার্য নয়। বরং শ্মশানের প্রতীকী আবহ, অন্ধকার, আগুনের আভাস, চরিত্রদের কণ্ঠস্বর, তাদের নীরবতা এবং দেহভঙ্গিই নাটকের প্রধান সম্পদ। বাদল সরকার যে থিয়েটারকে মানুষের কাছাকাছি আনতে চেয়েছিলেন, যেখানে কম খরচে, কম উপকরণে, যেকোনো উন্মুক্ত স্থানে নাটক সম্ভব, 'পাগলা ঘোড়া' সেই দর্শনের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। নাটকটি প্রসেনিয়ামের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়; বরং তার মানসিক তীব্রতা এমন যে, খোলা প্রাঙ্গণেও তা সমান শক্তিতে মঞ্চস্থ হতে পারে। এ-কারণেই এই নাটক বিকল্প থিয়েটারের আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব পায়।

নাটকের ভাষাও বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। বাদল সরকারের ভাষা এখানে অলংকার-ভারাক্রান্ত নয়, আবার একেবারে নিছক কথ্যও নয়। এর মধ্যে আছে দৈনন্দিনতা, বিদ্রুপ, আত্মরক্ষা, হঠাৎ উন্মোচিত যন্ত্রণা, কখনও কবিত্বময় আবেশ, কখনও নির্মম নগ্নতা। ভাষা চরিত্রগুলির মনস্তত্ত্ব প্রকাশের মাধ্যম হলেও তা শুধু তথ্যবহ নয়; এটি নাটকের অন্তঃস্রোত নির্মাণ করে। অনেক সময় চরিত্ররা যা বলে, তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তারা কী এড়িয়ে যায়, কী চাপা রাখে, কোথায় থেমে যায়। এই অসম্পূর্ণতা, বিরতি এবং ভাঙন নাটকটিকে গভীরতা দেয়। বিকল্প থিয়েটারের ভাষা হিসাবে এটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এখানে ভাষা কেবল সংলাপ নয়, বরং নীরবতার সঙ্গে মিলিত হয়ে এক নাট্য-সত্য তৈরি করে। 'পাগলা ঘোড়া' নাটকের শিরোনাম নিজেই এক শক্তিশালী প্রতীক। 'পাগলা ঘোড়া' বাস্তব কোনও প্রাণী হিসেবে নাটকে উপস্থিত নয়, কিন্তু এটি এক দমবন্ধ, উন্মত্ত, নিয়ন্ত্রণহীন গতি ও চেতনার প্রতিরূপ। একদিকে এটি জীবনের অস্থির ও বেপরোয়া ছুটে চলার প্রতীক, অন্যদিকে দমিত আবেগ, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা এবং চাপা অপরাধবোধের বিক্ষুব্ধ অভ্যন্তরীণ শক্তিকেও চিহ্নিত করে। ঘোড়া সাধারণত শক্তি, গতি ও স্বাধীনতার চিহ্ন; কিন্তু যখন তা 'পাগলা', তখন এই শক্তি আর সুসংহত থাকে না, তা হয়ে ওঠে আত্মধ্বংসী। নাটকের পুরুষ চরিত্রদের মানসিক অবস্থা, তাদের ছিন্নবিচ্ছিন্ন স্মৃতি, ভেঙে যাওয়া প্রেম, আর অনিয়ন্ত্রিত আত্মগোপন- সবকিছুই যেন এই 'পাগলা ঘোড়া'র মধ্যে রূপকভাবে সংগঠিত হয়েছে। এই প্রতীকের ব্যবহারে বাদল সরকার নাটকটিকে শুধু সামাজিক বাস্তবতায় সীমাবদ্ধ রাখেননি; তিনি তাকে এক অস্তিত্ববাদী ও প্রতীকী স্তরে উন্নীত করেছেন।

নাটকটিতে নারী-পুরুষ সম্পর্কের প্রশ্নটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চারজন পুরুষের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, প্রেম তাদের কাছে আসলে কখনও পূর্ণ মানবিক অঙ্গীকারের বিষয় হয়ে ওঠেনি। তারা প্রেম করেছে, কিন্তু তার দায় নেয়নি; তারা আকাঙ্ক্ষা করেছে, কিন্তু স্বাধীন সত্তাকে স্বীকৃতি দেয়নি; তারা আবেগের কথা বলেছে, কিন্তু সামাজিক সাহস দেখায়নি। এই ব্যর্থতাই নারীর বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে 'পাগলা ঘোড়া' কেবল প্রেমের নাটক নয়, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে প্রেমের ভণ্ডামির নাটকও বটে। মৃত নারীর উপস্থিতিহীন উপস্থিতি বারবার এই প্রশ্ন তোলে যে, সমাজে নারীর জন্য কী পরিসর রাখা হয়েছে? সে কি কেবল পুরুষের স্মৃতি, কামনা, অনুশোচনা বা অপরাধবোধের অবলম্বন? নাকি তার নিজস্ব বেদনা, প্রতিবাদ এবং সত্তা রয়েছে?

বাদল সরকার এই প্রশ্নের সরল উত্তর দেন না; বরং নাটকের বয়নেই এমনভাবে পরিস্থিতি নির্মাণ করেন যাতে দর্শক নিজেই পুরুষকেন্দ্রিক সামাজিক নীতির নির্মমতা উপলব্ধি করতে পারে।

এই নাটককে বিকল্প থিয়েটারের আলোচনায় স্থাপন করতে গেলে আরও একটি বিষয় স্মরণযোগ্য- বাদল সরকারের নাটকে দর্শকের অবস্থান। প্রচলিত নাটকে দর্শক প্রায়শই একটি দূরত্ব বজায় রেখে নাট্যকাহিনি দেখে। কিন্তু বাদল সরকার সেই দূরত্ব ভাঙতে চেয়েছেন। 'পাগলা ঘোড়া' দর্শককে নিরাপদ পর্যবেক্ষকের জায়গায় থাকতে দেয় না। শ্মশানের আবহ, চরিত্রদের আত্মউন্মোচন, অস্বস্তিকর স্বীকারোক্তি এবং বারবার ফিরে আসা মৃত্যুচেতনা দর্শককে মানসিকভাবে জড়িয়ে ফেলে। দর্শক বুঝতে পারে যে, এই চার চরিত্র কেবল নাটকের চরিত্র নয়; তারা সমাজের, এমনকি দর্শকের নিজের ভেতরেরও প্রতিনিধি। এই জড়িয়ে পড়ার অনুভূতিই বিকল্প থিয়েটারের শক্তি। এখানে নাটক দেখা মানে কেবল শিল্প উপভোগ নয়; বরং আত্মসমালোচনার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাওয়া। বাদল সরকারের নাট্যচিন্তায় রাজনৈতিক বোধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও 'পাগলা ঘোড়া' প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক স্লোগানময় নাটক নয়, তবু এটি গভীরভাবে রাজনৈতিক, কারণ এটি সমাজের নৈতিক কাঠামো, শ্রেণিগত নির্মাণ, লিঙ্গ-অসাম্য এবং সামাজিক শিষ্টতার অন্তর্নিহিত সহিংসতাকে উদ্ঘাটিত করে। নাটকের পুরুষদের প্রেম-ব্যর্থতা নিছক ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি নয়; এগুলি সেই সমাজের প্রতিফলন, যেখানে সামাজিক সম্মান, পারিবারিক চাপ, শ্রেণিগত অবস্থান এবং পৌরুষের মুখোশ সত্যিকারের মানবিক সম্পর্কের থেকে বেশি মূল্যবান হয়ে ওঠে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে 'পাগলা ঘোড়া' ব্যক্তিগত স্মৃতির নাটক হয়েও সামাজিক নিষ্ঠুরতার নাটক হয়ে ওঠে। বিকল্প থিয়েটার এখানে তার রাজনৈতিক তাৎপর্য অর্জন করে- প্রচারমূলক বক্তব্যের মাধ্যমে নয়, বরং ব্যক্তি-মানসের ভিতর দিয়ে সমাজের গভীর অসুখ দেখানোর মাধ্যমে। নাটকটির গঠন ও বয়ান-প্রকরণে এক ধরনের কাব্যিকতা আছে, কিন্তু তা রোমান্টিক নয়। বরং এই কাব্যিকতা নির্মিত হয়েছে অন্ধকার, শূন্যতা, অর্ধস্মৃতি, বিষণ্ণতা এবং অনুচ্চারিত যন্ত্রণার ভিতরে। এতে নাটকটি এক বিশেষ আবহ সৃষ্টি করে, যা দর্শক বা পাঠককে বাস্তবতার বাইরে নিয়ে যায় না; বরং বাস্তবতার আরও গভীর স্তরে নামিয়ে দেয়। এই কাব্যিক ঘনত্ব বাদল সরকারের নাট্যভাষাকে স্বাতন্ত্র্য দেয়। বিকল্প থিয়েটারের আলোচনায় এই দিকটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখানে নাটকের শক্তি বাহ্যিক আড়ম্বরে নয়; শব্দ, নীরবতা, আবহ এবং অভিনয়ের অন্তর্নিহিত সংগীতে। 'পাগলা ঘোড়া' নাটককে অনেকেই মনস্তাত্ত্বিক নাটক, প্রতীকী নাটক, মৃত্যুচিন্তার নাটক, বা অস্তিত্ববাদী নাটক হিসেবে বিচার করেছেন। এই সব দৃষ্টিভঙ্গিই আংশিকভাবে সত্য। কিন্তু বাদল সরকারের নাট্যদর্শনের প্রেক্ষিতে একে বিকল্প থিয়েটারের আলোয় পড়লে বোঝা যায়, এই সমস্ত স্তর আসলে একটি বৃহত্তর শিল্পপ্রকল্পের অংশ। তিনি এমন এক নাটক রচনা করতে চেয়েছেন, যা একই সঙ্গে সহজে মঞ্চস্থ করা যায়, দর্শকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করে, সামাজিক সত্যকে নির্মমভাবে উন্মোচিত করে, এবং বাহ্যিক প্লটের পরিবর্তে মানবমনের গভীর চলাচলকে নাট্যরূপ দেয়। 'পাগলা ঘোড়া' এই চারটি লক্ষ্যই সফলভাবে পূরণ করে।

বাদল সরকারের নাট্যযাত্রার একটি বড় তাৎপর্য হলো তিনি বাংলা নাটককে কেবল বিষয়বস্তুর দিক থেকে নয়, রীতি, ভাষা ও দর্শন- সব দিক থেকেই নতুনভাবে ভাবতে শিখিয়েছেন। তাঁর কাছে বিকল্প থিয়েটার নিছক কম খরচের থিয়েটার নয়; এটি এমন এক শিল্পচর্চা, যা মানুষকে মানুষ সম্পর্কে নতুন বোধ দেয়। এই অর্থে 'পাগলা ঘোড়া' একটি স্মরণীয় নাটক, কারণ এটি আমাদের দেখায় যে মৃতের সামনে দাঁড়িয়ে জীবিত মানুষের সত্য আরও উন্মোচিত হয়। যে যুবতীটি আর নেই, সে-ই যেন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে ওঠে। যে পুরুষেরা বেঁচে আছে, তারাই যেন ভিতরে ভিতরে মৃত। এই উলটপুরাণের মধ্য দিয়েই নাটকটির শক্তি তৈরি হয়। নাটকের শেষপর্যন্ত এসে দর্শক বা পাঠক অনুভব করে যে এখানে কোনও সহজ নিষ্পত্তি নেই। কেউ মুক্ত হয় না, কেউ সম্পূর্ণ শুদ্ধ হয় না, কেউই নিজের দায় থেকে অব্যাহতি পায় না। কিন্তু তবুও এই নাটক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি

দায়বোধের অনিবার্যতা সামনে আনে। এই দায় কেবল কোনও ব্যক্তিগত সম্পর্কের নয়; এটি মানুষের প্রতি মানুষের দায়, সমাজের প্রতি নৈতিক দায়, সত্যের প্রতি দায়। বাদল সরকারের বিকল্প থিয়েটার এই দায়বোধকে জাগিয়ে তুলতে চায়। 'পাগলা ঘোড়া' সেই প্রকল্পে এক সার্থক সংযোজন।

সবশেষে বলা যায়, 'পাগলা ঘোড়া' বাদল সরকারের নাট্যভুবনের এমন একটি পাঠ, যেখানে বিকল্প থিয়েটারের নন্দন, দর্শন এবং রাজনৈতিক চেতনা একত্রে ধরা পড়ে। শ্মশানঘাটের সীমিত পরিসরকে কেন্দ্র করে তিনি মানুষের সম্পর্কের জটিলতা, প্রেমের ব্যর্থতা, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিষ্ঠুরতা, স্মৃতির দহন এবং জীবনের অন্তর্নিহিত শূন্যতাকে এমনভাবে মঞ্চে এনেছেন, যা বাংলা নাটকে এক অভিনব মাত্রা যোগ করে। এই নাটক প্রমাণ করে যে বিকল্প থিয়েটার কেবল একটি ভিন্ন মঞ্চরীতি নয়; এটি এক ভিন্ন মানবদৃষ্টি। সেই মানবদৃষ্টিতে মানুষকে দেখা হয় তার আড়ালের মুখোশ ভেদ করে, সমাজকে দেখা হয় তার সুসভ্যতার মুখের আড়ালের নির্মমতা সমেত, আর নাটককে দেখা হয় জীবনের সবচেয়ে অনিবার্য প্রশ্নগুলির সঙ্গে লড়াই করার একটি শিল্পমাধ্যম হিসেবে। এই কারণেই 'পাগলা ঘোড়া' কেবল বাদল সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ নাটক নয়; এটি বাংলা বিকল্প নাট্যধারারও এক মৌলিক দলিল।

তথ্যসূত্র:

১. সরকার, বাদল। নাটক সমগ্র (দ্বিতীয় খন্ড)। মিত্র ও ঘোষ পাবলিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ - ভাদ্র ১৪১৭, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, পৃ. ৩৮৫।
২. তদেব, পৃ. ৪০২।
৩. তদেব, পৃ. ৪১১।
৪. তদেব, পৃ. ৪২৭।
৫. তদেব, পৃ. ৪১০।
৬. তদেব, পৃ. ৪৩৮।
৭. তদেব, পৃ. ৩৯৪।
৮. তদেব, পৃ. ৩৯৪।
৯. তদেব, পৃ. ৪৩৮।
১০. চৌধুরী, দর্শন। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস। পুস্তক বিপণি, পঞ্চম সংস্করণ- সেপ্টেম্বর ২০১১, কলকাতা-০৯, পৃ. ৪৮০।